Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501043 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Digital Thought in Bengali Short Stories: A Recent Review
বাংলা ছোটোগল্পে ডিজিটাল ভাবনা: একটি সাম্প্রতিক পর্যালোচনা

Dr. Mousumi Banerjee
Assistant Professor
Bengali Department
Rampurhat College, Birbhum

Received on: 01st May 2026
Accepted on: 18th May 2026

Abstract:
The rapid advancement of information technology in the 21st century has profoundly transformed the way people live, think, and social relationships. The reflection of this change is also clearly visible in literature, especially in Bengali short stories. The present article analyzes the increasing presence of digital concepts in Bengali short stories from a theoretical and text-critical perspective. It is shown here that digital technology has not only provided new content, but has also reshaped storytelling, language use, character creation, and the role of the reader. Virtual relationships, digital loneliness, algorithmic culture, and data-driven identities—these concepts are creating new types of experiences in Bengali short stories. However, while this change holds potential, it also poses challenges in terms of literary depth and language artistry. The article argues that the Bengali short story is currently in a 'hybrid' state, where traditional literary genres and new trends of the digital age are clashing and dialogued to create a new form.

Key Words:
Bengali Short Stories; Digital Literature; Narrative Transformation; Cyberculture; Digital Communication; Banglish; Contemporary Bengali Fiction

মূল প্রবন্ধ

ভূমিকা:

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ছোটোগল্প অনন্য স্থানের অধিকারী। কারণ এটি সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যেই জীবনের গভীরতম সত্যকে প্রকাশ করতে সক্ষম। উনিশ শতকের শেষভাগ এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে এই ধারাটি যখন বিকশিত হয়, তখন তার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বাস্তববাদ, মানবিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রতিফলন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ যেমন পরিবর্তিত হয়েছে, তেমনি সাহিত্যও তার রূপ ও বিষয়বস্তুতে পরিবর্তিত হয়েছে। বিশেষ করে একবিংশ শতাব্দীতে ডিজিটাল প্রযুক্তির আগমন মানুষের অভিজ্ঞতাকে এমনভাবে রূপান্তরিত করেছে যে বাস্তব ও ভার্চুয়ালের মধ্যে পার্থক্য ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তন বাংলা ছোটোগল্পের ক্ষেত্রেও গভীর প্রভাব ফেলেছে। এখন গল্পের চরিত্রেরা শুধু বাস্তব জগতে নয়, বরং অনলাইন জগতে বাস করে;

© Santiniketan Sahityapath

তাদের সম্পর্ক, দ্বন্দ্ব এবং অভিজ্ঞতাও অনেকাংশে ডিজিটাল মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এই প্রবন্ধে আমরা অনুসন্ধান করব কীভাবে এই ডিজিটাল বাস্তবতা বাংলা ছোটোগল্পে প্রতিফলিত হচ্ছে এবং এর ফলে সাহিত্যিক রূপান্তর কীভাবে ঘটছে।

তাত্ত্বিক আলোচনা:

ডিজিটাল যুগের সাহিত্য বোঝার জন্য 'বাস্তবতা' ধারণাটির পুনর্বিবেচনা অত্যন্ত জরুরি। আধুনিক তাত্ত্বিকরা দেখিয়েছেন যে বর্তমান যুগে আমরা এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছি যেখানে বাস্তব এবং তার প্রতিরূপের মধ্যে পার্থক্য ক্রমশ মুছে যাচ্ছে। এই অবস্থাকে অনেক সময় 'হাইপাররিয়ালিটি' বলা হয়, যেখানে মানুষ এমন এক বাস্তবতার অভিজ্ঞতা লাভ করে যা প্রকৃত বাস্তবতার চেয়েও বেশি প্রভাবশালী। বাংলা ছোটগল্পে এই ধারণার প্রতিফলন স্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, অনেক সমকালীন গল্পে দেখা যায় যে চরিত্রদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে শুধুমাত্র অনলাইন যোগাযোগের মাধ্যমে। তারা একে অপরকে বাস্তবে কখনো দেখে নি। কিন্তু তবুও তাদের আবেগ, প্রত্যাশা এবং হতাশা অত্যন্ত বাস্তব। এই ধরনের গল্পে প্রশ্ন ওঠে — বাস্তবতা কি শুধুমাত্র শারীরিক উপস্থিতির উপর নির্ভর করে, নাকি ডিজিটাল উপস্থিতিও সমানভাবে বাস্তব?

ডিজিটাল যুগে মানুষের পরিচয় ক্রমশ তার অনলাইন উপস্থিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। একজন ব্যক্তি তার সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল, পোস্ট, ছবি এবং অনলাইন আচরণের মাধ্যমে নিজেকে উপস্থাপন করে। ফলে তার পরিচয় একটি নির্মিত, পরিবর্তনশীল এবং অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত সত্তায় পরিণত হয়। বাংলা ছোটোগল্পে এই রূপান্তর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে উঠে এসেছে। কিছু গল্পে দেখা যায়, একজন চরিত্র তার অনলাইন পরিচয় হারিয়ে ফেললে সে এক ধরনের অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। এই পরিস্থিতি নির্দেশ করে যে ডিজিটাল উপস্থিতি এখন আর কেবল একটি অতিরিক্ত পরিচয় নয়, বরং ব্যক্তির অস্তিত্বের একটি কেন্দ্রীয় উপাদান। এখানে সাহিত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে — মানুষ কী তার শরীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত, নাকি তার তথ্য দ্বারা?

ডিজিটাল প্রভাব বাংলা ছোটোগল্পের কাঠামোকেও পরিবর্তিত করেছে। প্রথাগত গল্পে একটি সুস্পষ্ট শুরু, মধ্য এবং সমাপ্তি থাকলেও ডিজিটাল গল্পে এই ধারাবাহিকতা প্রায়ই ভেঙে যায়। গল্পটি কখনো চ্যাট মেসেজের মাধ্যমে, কখনো ইমেইল বিনিময়ের মাধ্যমে, আবার কখনো সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের ধারাবাহিকতায় এগিয়ে চলে। এই ধরনের গল্পে সময়ের ধারণাও পরিবর্তিত হয়। ঘটনাগুলি সরলরেখায় অগ্রসর না হয়ে খণ্ডিতভাবে উপস্থাপিত হয়, ফলে পাঠককে নিজেই ঘটনাগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে হয়। এর ফলে পাঠকের ভূমিকা আরো সক্রিয় হয়ে ওঠে, এবং সে কেবল পাঠক নয়, বরং অর্থ নির্মাণের একজন অংশগ্রহণকারী হয়ে ওঠে। ডিজিটাল যুগে ভাষাও একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বাংলা ছোটোগল্পে এখন প্রায়ই বাংলা ও ইংরেজির মিশ্রণ দেখা যায়, যা 'Banglish' নামে পরিচিত। এছাড়া সংক্ষিপ্ত রূপ, ইমোজি এবং কথ্য ভাষার ব্যবহার গল্পের ভাষাকে আরো অনানুষ্ঠানিক এবং দ্রুততর করে তুলেছে। এই পরিবর্তন একদিকে ভাষাকে আরো জীবন্ত ও সমকালীন করে তুললেও সাহিত্যিক শৈল্পিকতার ক্ষেত্রে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করে। বিশেষত, গভীর আবেগ বা জটিল ধারণা প্রকাশের ক্ষেত্রে এই সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত ভাষা কতটা কার্যকর — তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

সমকালীন বাংলা ছোটোগল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ডিজিটাল সম্পর্কের দ্বৈততা। একদিকে ডিজিটাল মাধ্যম মানুষের মধ্যে যোগাযোগের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে এটি এক ধরনের মানসিক বিচ্ছিন্নতাও তৈরি করছে। অনেক গল্পে দেখা যায় যে চরিত্ররা অনলাইনে অত্যন্ত সক্রিয় এবং জনপ্রিয়, কিন্তু বাস্তব জীবনে তারা গভীর একাকীত্বে ভোগে। এই দ্বন্দ্বটি আধুনিক জীবনের একটি মৌলিক সংকটকে প্রতিফলিত করে — সংযোগের প্রাচুর্যের মধ্যেও সম্পর্কের অভাব। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং এটি একটি নজরদারি কাঠামোও তৈরি করে। একজন ব্যক্তি কখন অনলাইনে আছে, কী পড়ছে, কী লিখছে — সবকিছুই ট্র্যাক করা সম্ভব। এই পরিস্থিতি গল্পে একটি নতুন ধরনের ক্ষমতার সম্পর্ক তৈরি করে। কিছু বাংলা ছোটোগল্পে দেখা যায়, একজন চরিত্র অন্যজনের 'last seen' বা 'online status' দেখে তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এই ধরনের পরিস্থিতি ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং স্বাধীনতার প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে।

সমকালীন বাংলা গল্পকার ও ডিজিটাল অভিজ্ঞতার প্রতিফলন:

© Santiniketan Sahityapath

একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে বাংলা ছোটগল্পে যে পরিবর্তনটি সবচেয়ে গভীরভাবে লক্ষণীয়, তা হলো ডিজিটাল অভিজ্ঞতার ক্রমবর্ধমান অন্তর্ভুক্তি। এই পরিবর্তন কেবল বিষয়বস্তুর স্তরে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি, চরিত্র নির্মাণ, ভাষার ব্যবহার এবং পাঠকের সঙ্গে টেক্সটের সম্পর্ক — সবকিছুকেই পুনর্গঠন করেছে। সমকালীন বাংলা গল্পকারদের রচনায় এই পরিবর্তন বহুমাত্রিকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, যা বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে বাংলা ছোটোগল্প এখন এক নতুন সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত পরিসরে প্রবেশ করেছে।

সাম্প্রতিক অনলাইন পত্রিকা ও সাহিত্য প্ল্যাটফর্মগুলিতে প্রকাশিত বহু বাংলা ছোটোগল্পে এই ডিজিটাল প্রভাব স্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, কিছু গল্প সম্পূর্ণরূপে চ্যাট-ভিত্তিক, যেখানে চরিত্রদের কথোপকথনের মাধ্যমেই পুরো গল্পটি নির্মিত হয়। আবার কিছু গল্পে ডিজিটাল স্মৃতি বা ডেটা সংরক্ষণের ধারণা ব্যবহার করে মানুষের স্মৃতি ও পরিচয়ের নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই গল্পগুলিতে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো — বাস্তব ও ভার্চুয়ালের মধ্যে একটি ক্রমাগত টানাপোড়েন যা গল্পের মূল নাটকীয়তা সৃষ্টি করে। প্রথমেই লক্ষ করা যায় যে আধুনিক বাংলা গল্পকাররা ক্রমশ এমন এক বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করছেন, আর কেবল ভৌত জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং বাস্তবতা এখন দ্বিস্তরীয় — একদিকে ভৌত জীবন, অন্যদিকে ডিজিটাল উপস্থিতি। এই দ্বৈত বাস্তবতার মধ্যে মানুষের অভিজ্ঞতা, সম্পর্ক এবং আত্মপরিচয় ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে, এবং গল্পকাররা এই পরিবর্তনকে তাদের রচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসছেন।

বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক পরিসরে কয়েকজন লেখকের কাজে ডিজিটাল বাস্তবতা বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্মরণজিৎ চক্রবর্তী, প্রচেত গুপ্ত, তিলোত্তমা মজুমদার এবং নবীন অনলাইন-ভিত্তিক লেখকগোষ্ঠী, তাদের লেখা মূলত ওয়েবপেজ, ব্লগ এবং সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

প্রচেত গুপ্ত:

প্রচেত গুপ্তের গল্পগুলিতে আমরা প্রযুক্তির এই সূক্ষ্ম কিন্তু গভীর প্রভাব লক্ষ করি। তাঁর রচনায় মোবাইল ফোন, এসএমএস বা অনলাইন যোগাযোগ প্রায়ই একটি সম্পর্কের মধ্যবর্তী সেতু হিসেবে কাজ করে, কিন্তু একইসঙ্গে এটি একটি দূরত্বও সৃষ্টি করে। একটি সম্পর্ক যখন সরাসরি সংলাপ থেকে সরে গিয়ে ডিজিটাল বার্তায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন সেই সম্পর্কের আবেগগত গভীরতা পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনটি শুধু গল্পের একটি উপাদান নয়, বরং আধুনিক জীবনের একটি বাস্তব প্রতিফলন। তাঁর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো — তিনি প্রযুক্তিকে কখনো সরাসরি আলোচনার বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন না; বরং প্রযুক্তি তাঁর গল্পে একটি নীরব কিন্তু কার্যকর উপস্থিতি হিসেবে কাজ করে, যা চরিত্রের মানসিকতা, সম্পর্কের গঠন এবং আবেগের বিন্যাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এই নীরব উপস্থিতিই তাঁর রচনাকে বিশেষভাবে সমকালীন করে তোলে, কারণ ডিজিটাল যুগে প্রযুক্তি মানুষের জীবনে ঠিক এইভাবেই কাজ করে — অদৃশ্য অথচ সর্বব্যাপী।

প্রচেত গুপ্তের গল্পে ডিজিটাল অভিজ্ঞতা প্রধানত তিনটি স্তরে প্রতিফলিত হয় — যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে, আবেগের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এবং সম্পর্কের কাঠামো পরিবর্তনকারী শক্তি হিসেবে। তাঁর গল্পে মোবাইল ফোন, মেসেজ, কল লগ, কিংবা মিসড কল — এইসব ক্ষুদ্র প্রযুক্তিগত উপাদানগুলি গল্পের ন্যারেটিভে এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যে সেগুলি ছাড়া গল্পের আবেগগত গতি বোঝা অসম্ভব হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর একটি গল্পে একটি চরিত্র বারবার মোবাইল স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং নিজেকে বলে — 'ও দেখেছে, কিন্তু উত্তর দেয়নি।' এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য বহন করে। এখানে 'দেখেছে' বা 'seen' হওয়া একটি প্রযুক্তিগত অবস্থা হলেও, তা আবেগগত প্রতিক্রিয়ার একটি সূচকে পরিণত হয়েছে। চরিত্রটি আর কেবল উত্তর না পাওয়ার কারণে হতাশ নয়; বরং সে জানে যে অপরজন তার বার্তাটি দেখেছে এবং তবুও প্রতিক্রিয়া জানায় নি। এই জ্ঞানই তার হতাশাকে তীব্রতর করে। এই ধরনের পরিস্থিতি প্রাক্-ডিজিটাল যুগে সম্ভব ছিল না, কারণ তখন যোগাযোগের অনিশ্চয়তা একটি স্বাভাবিক বিষয় ছিল। কিন্তু ডিজিটাল যুগে প্রযুক্তি সেই অনিশ্চয়তাকে দূর করে এবং একইসঙ্গে নতুন ধরনের মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। প্রচেত গুপ্ত এই পরিবর্তনটিকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর গল্পে প্রযুক্তি কেবল একটি বাহ্যিক উপকরণ নয়; বরং এটি আবেগের কাঠামোকে পুনর্গঠন করে।

© Santiniketan Sahityapath

আরেকটি গল্পে দেখা যায়, একটি সম্পর্ক ক্রমশ মুখোমুখি কথোপকথন থেকে সরে গিয়ে এসএমএস বা মেসেজে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। একটি সংক্ষিপ্ত সংলাপে চরিত্রটি বলে — 'তুমি এখন আর ফোন করো না, শুধু লিখে দাও।' এই উক্তিটি সম্পর্কের এক গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরকে নির্দেশ করে। এখানে 'ফোন করা' এবং 'লিখে দেওয়া' — এই দুটি ভিন্ন যোগাযোগ পদ্ধতির মধ্যে একটি আবেগগত পার্থক্য রয়েছে। ফোনে কণ্ঠস্বর, বিরতি, দ্বিধা — এইসব উপাদান থাকে, তা আবেগকে বহুমাত্রিক করে তোলে; কিন্তু টেক্সট মেসেজ সেই আবেগকে সংকুচিত করে একটি সংক্ষিপ্ত, প্রায় যান্ত্রিক রূপে নিয়ে আসে। এই সংকোচনটি প্রচেত গুপ্তের গল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ নন্দনতাত্ত্বিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। তাঁর চরিত্ররা প্রায়ই তাদের অনুভূতি সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে না; বরং তারা সংক্ষিপ্ত, অসম্পূর্ণ বাক্যে নিজেদের প্রকাশ করে। এই অসম্পূর্ণতাই তাদের সম্পর্কের জটিলতাকে আরো স্পষ্ট করে তোলে। প্রচেত গুপ্তের গল্পে 'মিসড কল' একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। একটি গল্পে একটি চরিত্র বলে — 'ওর মিসড কলটা দেখেই বুঝে গেলাম, কিছু একটা হয়েছে।' এখানে 'মিসড কল' একটি সংকেত হিসেবে কাজ করছে, সরাসরি কোনো বার্তা বহন করে না, কিন্তু তবুও একটি আবেগগত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই ধরনের সংকেতভিত্তিক যোগাযোগ ডিজিটাল যুগের একটি বৈশিষ্ট্য, যেখানে সম্পূর্ণ বার্তার পরিবর্তে আংশিক তথ্যই অর্থ নির্মাণের জন্য যথেষ্ট হয়ে ওঠে। প্রচেত গুপ্তের গল্পে পাঠককে প্রায়ই এই আংশিক সংকেতগুলি থেকে সম্পূর্ণ অর্থ নির্মাণ করতে হয়। ফলে পাঠক একটি সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হয়ে ওঠে, তা ডিজিটাল যুগের পাঠ-প্রক্রিয়ার সঙ্গো সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রচেত গুপ্তের গল্পে সময়ের ধারণাও প্রযুক্তির দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর একটি গল্পে, একটি চরিত্র অপেক্ষা করছে একটি মেসেজের জন্য, এবং সময়কে সে মাপছে মিনিট বা ঘণ্টার হিসেবে নয়, বরং 'কতক্ষণ হলো রিপ্লাই আসেনি' — এই হিসেবে। এই ধরনের সময়বোধ একটি নতুন ন্যারেটিভ সময় তৈরি করে, তা সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। এখানে সময় আর নিরপেক্ষ নয়; বরং এটি আবেগগতভাবে চার্জড। একটি মিনিটও দীর্ঘ মনে হতে পারে, যদি সেই সময়ে কোনো প্রত্যাশিত মেসেজ না আসে। এই অভিজ্ঞতাটি প্রচেত গুপ্ত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গো তার গল্পে উপস্থাপন করেন, তা পাঠকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গো সহজেই সংযোগ স্থাপন করে।

প্রচেত গুপ্তের গল্পে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো — ডিজিটাল নৈকট্য ও বাস্তব দূরত্বের দ্বন্দ্ব। একটি গল্পে একটি চরিত্র বলে — 'সারাদিন কথা হয়, তবু দেখা হয় না।' এই উক্তিটি ডিজিটাল যুগের সম্পর্কের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। এখানে 'কথা হওয়া' মানে ডিজিটাল যোগাযোগ প্রায় নিরবচ্ছিন্ন; কিন্তু সেই যোগাযোগ বাস্তব সাক্ষাতে রূপান্তরিত হয় না। ফলে একটি অদ্ভুত দ্বৈততা তৈরি হয় — নৈকট্য ও দূরত্ব একসঙ্গো বিদ্যমান। এই দ্বৈততা প্রচেত গুপ্তের গল্পে একটি স্থায়ী বিষয় হিসেবে উপস্থিত। তাঁর চরিত্ররা একে অপরের জীবনে উপস্থিত, কিন্তু সেই উপস্থিতি একটি ভার্চুয়াল পরিসরে সীমাবদ্ধ। ফলে সম্পর্কের মধ্যে একটি অসম্পূর্ণতা থেকে যায়, তা গল্পের আবেগগত গভীরতা বাড়ায়।

ভাষার দিক থেকেও প্রচেত গুপ্তের গল্পে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তাঁর সংলাপগুলি প্রায়ই সংক্ষিপ্ত, কথ্য এবং অসম্পূর্ণ। অনেক সময় একটি শব্দ বা একটি ছোটো বাক্যই একটি সম্পূর্ণ আবেগকে প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি চরিত্রের প্রতিক্রিয়া হিসেবে শুধু 'হুম' বা 'আচ্ছা' — এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়। এই শব্দগুলি আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হলেও, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এগুলি গভীর আবেগ বহন করে। এই ধরনের ভাষা ব্যবহার ডিজিটাল যোগাযোগের প্রভাবকে নির্দেশ করে, যেখানে সংক্ষিপ্ততা এবং দ্রুততা গুরুত্বপূর্ণ। একইসঙ্গো এটি সাহিত্যিক ভাষার একটি নতুন রূপ তৈরি করছে যা প্রথাগত বর্ণনামূলক ভাষা থেকে ভিন্ন।

সবশেষে বলা যায়, প্রচেত গুপ্তের গল্পে ডিজিটাল অভিজ্ঞতার প্রতিফলন সরাসরি বা প্রগলভ নয়; বরং এটি একটি সূক্ষ্ম, অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়া, চরিত্রের মনস্তত্ত্ব, সম্পর্কের গঠন এবং ভাষার ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। তাঁর গল্পগুলি আমাদের দেখায় যে ডিজিটাল প্রযুক্তি মানুষের জীবনে কীভাবে একটি নীরব কিন্তু গভীর পরিবর্তন ঘটাচ্ছে — যেখানে প্রতিটি 'seen', প্রতিটি 'missed call', প্রতিটি 'hmm' — একটি সম্পূর্ণ আবেগগত জগতের প্রতিনিধিত্ব করে। এই কারণে প্রচেত গুপ্তকে সমকালীন বাংলা ছোটোগল্পে ডিজিটাল অভিজ্ঞতার অন্যতম সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যাকার হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তাঁর রচনায় প্রযুক্তি কখনো কেন্দ্রীয়

© Santiniketan Sahityapath

চরিত্র নয়, কিন্তু তবুও তা সর্বত্র উপস্থিত — একটি অদৃশ্য শক্তির মতো যা মানুষের সম্পর্ক ও অনুভূতিকে নীরবে পুনর্গঠন করে চলেছে।

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী:

স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর মতো লেখকের গল্পে আমরা দেখতে পাই শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্গে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের একটি গভীর সংযোগ। তাঁর গল্পগুলিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম শুধু একটি প্রেক্ষাপট নয়, বরং চরিত্রের মানসিক গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর গল্পে প্রায়ই দেখা যায় যে চরিত্ররা নিজেদের বাস্তব জীবনের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পেতে ভার্চুয়াল জগতে একটি বিকল্প পরিচয় নির্মাণ করে। এই পরিচয় অনেক সময় তাদের কাছে বাস্তবের চেয়েও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই প্রবণতাটি আধুনিক সমাজে আত্মপরিচয়ের পরিবর্তনকে নির্দেশ করে, যেখানে ব্যক্তি তার 'ডিজিটাল সত্তা'র মাধ্যমে নিজেকে পুনর্নির্মাণ করে। তাঁর লেখার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো — তিনি আধুনিক জীবনের ডিজিটাল বাস্তবতাকে সরাসরি প্রযুক্তি-চর্চার আকারে নয়, বরং চরিত্রের অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা, সম্পর্কের সূক্ষ্ম টানাপোড়েন এবং আত্মপরিচয়ের নির্মাণের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেন। ফলে তাঁর গল্পে ডিজিটাল অভিজ্ঞতা কখনো দৃশ্যমান কাঠামো হিসেবে, আবার কখনো অদৃশ্য মানসিক পরিসর হিসেবে কাজ করে।

স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর গল্পগুলিতে সোশ্যাল মিডিয়া, বিশেষত ফেসবুক বা অনুরূপ ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম, একটি 'আত্ম-প্রদর্শনের মঞ্চ' হিসেবে উপস্থিত হয়। তাঁর একটি গল্পে চরিত্রটি নিজের প্রোফাইল পেজের দিকে তাকিয়ে স্বীকার করে — 'এখানে আমি যেমন হতে চাই, তেমনই' — এই সংক্ষিপ্ত উক্তিটি ডিজিটাল পরিচয়ের নির্মাণগত প্রকৃতিকে স্পষ্ট করে। এখানে 'যেমন হতে চাই' এবং 'যেমন আছি' — এই দুইয়ের মধ্যে একটি ব্যবধান রয়েছে যা ভার্চুয়াল জগতে পূরণ করা সম্ভব। এই অবস্থাটি এমন একটি ধারণার সঙ্গে যুক্ত করা যায়, যেখানে ব্যক্তি একটি সামাজিক মঞ্চে নিজের পরিচয়কে সচেতনভাবে নির্মাণ করে। এই নির্মাণ প্রক্রিয়ার মধ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব কাজ করে — বাস্তব সত্তা এবং ডিজিটাল সত্তার মধ্যে দূরত্ব। স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর গল্পে চরিত্ররা প্রায়ই এই দূরত্বকে অনুভব করে, কিন্তু তারা তা অতিক্রম করতে পারে না। বরং তারা ক্রমশ সেই ডিজিটাল সত্তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। একটি গল্পে একটি চরিত্র বলে — 'বাস্তবে আমি যতটা না কথা বলি, এখানে তার চেয়ে অনেক বেশি' — এই উক্তিটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের একটি মুক্তিকামী দিককে তুলে ধরে। এখানে প্রযুক্তি ব্যক্তি-সত্তাকে প্রসারিত করে, তাকে নতুনভাবে প্রকাশের সুযোগ দেয়। তবে এই প্রসারণ সবসময় ইতিবাচক নয়। স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর গল্পে ডিজিটাল সম্পর্ক প্রায়ই ভঙ্গুর এবং অস্থায়ী। একটি গল্পে দেখা যায়, দীর্ঘদিনের অনলাইন যোগাযোগ হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায়, এবং চরিত্রটি প্রশ্ন করে — 'এতদিন যা ছিল, সেটা কি সত্যি ছিল?' এই প্রশ্নটি ডিজিটাল সম্পর্কের অস্তিত্বগত অবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এখানে সম্পর্কের বাস্তবতা তার স্থায়িত্ব বা গভীরতার উপর নির্ভর করছে না; বরং তার অস্তিত্বই অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। এই অনিশ্চয়তা স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর গল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ ন্যারেটিভ টেনশন তৈরি করে। তাঁর চরিত্ররা প্রায়ই একটি 'in-between' অবস্থায় থাকে — না পুরোপুরি বাস্তবে, না পুরোপুরি ভার্চুয়ালে।

স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর গল্পে ভাষার ব্যবহারেও ডিজিটাল প্রভাব স্পষ্ট। তাঁর সংলাপগুলি প্রায়ই সংক্ষিপ্ত, কথ্য এবং ডিজিটাল যোগাযোগের ধাঁচে নির্মিত। উদাহরণস্বরূপ, একটি সংলাপে দেখা যায় — 'ok, থাক' — এই দুই শব্দের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ আবেগগত পরিবর্তন নিহিত রয়েছে। এখানে 'ok' শব্দটি আপাতদৃষ্টিতে নিরপেক্ষ, কিন্তু 'থাক' শব্দটি একটি সমাপ্তির ইঙ্গিত দেয়। এই ধরনের সংক্ষিপ্ত সংলাপ ডিজিটাল যুগের ভাষার বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করে, যেখানে কম শব্দে বেশি অর্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও, তাঁর গল্পে 'seen', 'typing… ', 'last active' — এই ধরনের ডিজিটাল সূচকগুলি প্রায়ই পরোক্ষভাবে উপস্থিত থাকে এবং চরিত্রের মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। একটি গল্পে একটি চরিত্র বলে — 'দেখলাম অনলাইনে আছে, কিন্তু আমার মেসেজের উত্তর নেই' — এই উক্তিটি ডিজিটাল উপস্থিতি ও আবেগগত অনুপস্থিতির দ্বন্দ্বকে স্পষ্ট করে। এখানে 'অনলাইনে থাকা' একটি প্রযুক্তিগত অবস্থা হলেও, তা আবেগগত প্রত্যাশার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর গল্পে সময়ের ধারণাও ডিজিটাল প্রভাবের দ্বারা পরিবর্তিত। একটি চরিত্র যখন বলে — 'কাল রাতের পর থেকে আর কোনো মেসেজ নেই' — তখন সেই 'কাল রাত' একটি নির্দিষ্ট সময় নয়; বরং একটি আবেগগত সীমারেখা। সেই মুহূর্তের পর থেকে সম্পর্কের গতিপথ বদলে গেছে।

© Santiniketan Sahityapath

গল্পে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো — ডিজিটাল স্মৃতি। তাঁর গল্পে প্রায়ই দেখা যায়, পুরনো মেসেজ, ছবি বা পোস্ট স্মৃতির একটি বিকল্প আর্কাইভ হিসেবে কাজ করছে। একটি চরিত্র বলে — 'পুরনো চ্যাটগুলো পড়লে মনে হয় সবকিছু আবার ফিরে আসে' — এই উক্তিটি স্মৃতির একটি ডিজিটাল রূপকে নির্দেশ করে, যেখানে স্মৃতি আর শুধুমাত্র মানসিক নয়, বরং প্রযুক্তিগতভাবে সংরক্ষিত। এই অবস্থাটি স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার সম্পর্ককে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে। তবে এই ডিজিটাল স্মৃতি সবসময় সান্ত্বনাদায়ক নয়। অনেক ক্ষেত্রে এটি একটি পুনরাবৃত্তি তৈরি করে যা চরিত্রকে অতীত থেকে মুক্ত হতে দেয় না। ফলে স্মৃতি একটি বোঝা হয়ে ওঠে যা প্রযুক্তির মাধ্যমে বারবার ফিরে আসে।

স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর গল্পে ডিজিটাল একাকীত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ থিম। তাঁর চরিত্ররা প্রায়ই বহু মানুষের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু তবুও তারা একা। তাঁর একটি গল্পে, একটি চরিত্র বলে — 'অনেকেই আছে, কিন্তু কথা বলার মতো কেউ নেই' — এই উক্তিটি ডিজিটাল যুগের সামাজিকতার একটি মৌলিক সংকটকে প্রকাশ করে। এখানে সংযোগের প্রাচুর্য সম্পর্কের গভীরতাকে নিশ্চিত করে না; বরং কখনো কখনো তা আরো শূন্যতা তৈরি করে। এই একাকীত্বের সঙ্গে জড়িত রয়েছে একটি আত্ম-পর্যবেক্ষণের প্রবণতা। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের পোস্ট, ছবি বা প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে চরিত্ররা নিজেদেরকে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করে এবং মূল্যায়ন করে। ফলে আত্মপরিচয় একটি স্থির সত্তা নয়; বরং একটি পরিবর্তনশীল, প্রতিক্রিয়ানির্ভর নির্মাণে পরিণত হয়।

সবশেষে বলা যায়, স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর গল্পে ডিজিটাল অভিজ্ঞতা একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া যা ব্যক্তি-সত্তা, সম্পর্ক, ভাষা এবং সময় — সবকিছুকে পুনর্গঠন করে। তাঁর রচনায় প্রযুক্তি কখনো সরাসরি আলোচিত না হলেও, তা সর্বত্র উপস্থিত — চরিত্রের চিন্তায়, সংলাপে, নীরবতায় এবং এমনকি অনুপস্থিতির মধ্যেও। এই কারণেই স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর গল্পগুলি সমকালীন বাংলা ছোটগল্পে ডিজিটাল যুগের অভিজ্ঞতা বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ টেক্সট হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তাঁর লেখায় আমরা দেখতে পাই, কীভাবে একটি 'লাইক', একটি 'seen', বা একটি 'typing…' — এই ক্ষুদ্র সংকেতগুলিই মানুষের সম্পর্ক ও অনুভূতির জটিল মানচিত্র নির্মাণ করে।

তিলোত্তমা মজুমদার:

সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যে নারীর অন্তর্জগৎ, সম্পর্কের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব এবং নীরব মানসিক টানাপোড়েনকে গভীর সংবেদনশীলতায় তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিলোত্তমা মজুমদার একটি স্বতন্ত্র অবস্থান অধিকার করেন। তাঁর লেখায় প্রযুক্তি বা ডিজিটাল মাধ্যম খুব কম ক্ষেত্রেই সরাসরি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে উপস্থিত হয়; বরং তা একটি অন্তর্লীন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করে। এই অন্তর্লীনতাই তাঁর রচনায় ডিজিটাল অভিজ্ঞতাকে আরো সূক্ষ্ম ও জটিল করে তোলে, কারণ এখানে প্রযুক্তি দৃশ্যমান অবকাঠামো নয়, বরং অভিজ্ঞতার অবচেতনে প্রবেশ করেছে। তিলোত্তমা মজুমদারের গল্পগুলিতে যে একাকীত্ব, বিচ্ছিন্নতা এবং আত্ম-অন্বেষণের প্রবণতা দেখা যায়, তা সমকালীন ডিজিটাল জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। যদিও তাঁর গল্পে চরিত্ররা সবসময় মোবাইল ফোন, সোশ্যাল মিডিয়া বা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম নিয়ে সরাসরি আলোচনা করে না, তবুও তাদের জীবনযাপন, সম্পর্কের ভঙ্গি এবং যোগাযোগের ধরন এই প্রযুক্তিগত বাস্তবতার দ্বারা প্রভাবিত। এই প্রভাবটি বোঝার জন্য তাঁর গল্পগুলিকে একটি 'post-digital sensibility' — এর আলোকে পড়া প্রয়োজন, যেখানে প্রযুক্তি আর আলাদা করে চিহ্নিত করার বিষয় নয়, বরং জীবনযাত্রার একটি স্বাভাবিক অংশ। তাঁর একটি গল্পে একটি নারী চরিত্র নিজের অবস্থান সম্পর্কে বলে — 'চারপাশে এত মানুষ, তবু যেন কোথাও পৌঁছনো যায় না' — এই সংক্ষিপ্ত উক্তিটি সমকালীন জীবনের এক গভীর অস্তিত্বগত সংকটকে প্রকাশ করে। এখানে 'মানুষ থাকা' এবং 'পৌঁছনো না যাওয়া' — এই দ্বৈততা ডিজিটাল যুগের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যায়, যেখানে যোগাযোগের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও সম্পর্কের গভীরতা অনুপস্থিত। এই অভিজ্ঞতাকে ডিজিটাল একাকীত্বের একটি রূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়, যদিও তা সরাসরি প্রযুক্তির ভাষায় প্রকাশিত হয় না। তিলোত্তমা মজুমদারের গল্পে সম্পর্কের ভাঙন বা দূরত্ব প্রায়ই সরাসরি সংঘাতের মাধ্যমে নয়, বরং নীরবতার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। তাঁর একটি গল্পে, একটি চরিত্র উপলব্ধি করে — 'কথা কমে গেছে, অথচ কিছুই বলা হয়নি' — এই সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণটি আধুনিক যোগাযোগের একটি বৈপরীত্যকে তুলে ধরে। ডিজিটাল যুগে যোগাযোগের মাধ্যম বেড়েছে, কিন্তু সেই যোগাযোগের গুণগত মান সবসময় বৃদ্ধি পায়নি। ফলে সম্পর্কের মধ্যে একটি নীরব প্রবাহ তৈরি হয়, তা তিলোত্তমা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ধরতে পারেন। এই নীরবতার মধ্যে ডিজিটাল প্রভাবকে পড়া যায় 'অনুপস্থিতির মধ্যে উপস্থিতি' হিসেবে। অর্থাৎ, চরিত্ররা একে অপরের জীবনে উপস্থিত, কিন্তু সেই

© Santiniketan Sahityapath

উপস্থিতি কার্যকর নয়। এই অবস্থাটি অনেক সময় এমনভাবে প্রকাশিত হয়, যেখানে চরিত্ররা একে অপরের সম্পর্কে জানে, কিন্তু সেই জ্ঞান তাদের মধ্যে কোনো বাস্তব সংযোগ তৈরি করে না। এই অভিজ্ঞতাটি ডিজিটাল যুগে অত্যন্ত সাধারণ, যেখানে আমরা অনেকের জীবন সম্পর্কে অবগত, কিন্তু সেই অবগতির সঙ্গে কোনো গভীর সম্পর্ক তৈরি হয় না।

তিলোত্তমা মজুমদারের গল্পে স্মৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এই স্মৃতি প্রায়ই বর্তমানের সঙ্গে একটি টানাপোড়েন তৈরি করে। ডিজিটাল যুগে স্মৃতি কেবল মানসিক নয়, বরং প্রযুক্তিগতভাবে সংরক্ষিত — ছবি, মেসেজ, আর্কাইভ ইত্যাদির মাধ্যমে। যদিও তাঁর গল্পে এই প্রযুক্তিগত দিকটি সরাসরি উল্লেখিত হয় না, তবুও স্মৃতির পুনরাবৃত্তি এবং তার থেকে মুক্ত হতে না পারার যে প্রবণতা দেখা যায়, তা ডিজিটাল স্মৃতির ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত। একটি গল্পে একটি চরিত্র বলে — 'যা চলে গেছে, তা কি সত্যিই যায়?' — এই প্রশ্নটি স্মৃতির স্থায়িত্ব এবং তার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে। ডিজিটাল যুগে এই প্রশ্নটি আরো জটিল হয়ে ওঠে, কারণ অতীতের প্রতিটি মুহূর্ত প্রযুক্তির মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকতে পারে এবং যে-কোনো সময় পুনরায় উপস্থিত হতে পারে। ফলে অতীত আর সম্পূর্ণভাবে অতীত থাকে না; বরং তা বর্তমানের মধ্যে বারবার ফিরে আসে।

তিলোত্তমা মজুমদারের ভাষা ও বর্ণনাশৈলী এই অভিজ্ঞতাকে আরো গভীর করে তোলে। তাঁর বাক্যগুলি প্রায়ই ধীর, সংবেদনশীল এবং অন্তর্মুখী, ডিজিটাল যুগের দ্রুততা ও সংক্ষিপ্ততার বিপরীতে একটি ভিন্ন নন্দনতত্ত্ব তৈরি করে। এই বৈপরীত্যটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি দেখায় যে সব সমকালীন লেখকই ডিজিটাল ভাষার সরাসরি অনুকরণ করছেন না; বরং কেউ কেউ সেই প্রভাবকে প্রতিরোধ বা পুনর্বিন্যাস করছেন। তিনি ডিজিটাল অভিজ্ঞতাকে সরাসরি উপস্থাপন না করে তার মানসিক ও আবেগগত প্রভাবকে বিশ্লেষণ করেন। ফলে তাঁর গল্পে প্রযুক্তি একটি অনুপস্থিত উপস্থিতি — যা দৃশ্যমান নয়, কিন্তু অনুভূত হয়। তাঁর গল্পে নারী চরিত্রগুলির অভিজ্ঞতাও এই ডিজিটাল প্রেক্ষাপটে নতুনভাবে পড়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা নিজেদের অবস্থান, সম্পর্ক এবং পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলে, যা আধুনিক সামাজিক ও প্রযুক্তিগত বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত। যদিও তারা সরাসরি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিজেদের প্রকাশ করছে না, তবুও তাদের আত্ম-অন্বেষণ একটি এমন সমাজে ঘটছে, যেখানে ডিজিটাল যোগাযোগ একটি মৌলিক উপাদান।

তিলোত্তমা মজুমদারের গল্পে সময়ের ধারণাও গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সময় প্রায়ই স্থির, ধীর এবং পুনরাবৃত্তিমূলক, যা ডিজিটাল সময়ের দ্রুততা ও তাৎক্ষণিকতার বিপরীত। এই ধীরতা একটি প্রতিরোধের রূপ হিসেবেও কাজ করে, যেখানে লেখক ডিজিটাল যুগের তাড়াহুড়োকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন এবং পাঠককে একটি গভীর, মনোযোগী পাঠের দিকে আহ্বান জানান। সবশেষে বলা যায়, তিলোত্তমা মজুমদারের গল্পে ডিজিটাল অভিজ্ঞতার প্রতিফলন সরাসরি নয়, বরং অন্তর্লীন ও মানসিক। তিনি প্রযুক্তিকে একটি বাহ্যিক উপাদান হিসেবে নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক ও মানসিক বাস্তবতা হিসেবে উপস্থাপন করেন, যা চরিত্রের অভিজ্ঞতা, সম্পর্ক এবং আত্মপরিচয়কে প্রভাবিত করে। তাঁর এই সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি সমকালীন বাংলা ছোটগল্পে ডিজিটাল যুগের একটি ভিন্ন এবং গভীর পাঠের সম্ভাবনা তৈরি করে।

অর্পিতা সরকার:

সমকালীন বাংলা ছোটগল্পে ডিজিটাল অভিজ্ঞতার ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অর্পিতা সরকারের রচনা একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্থান অধিকার করে। বাংলা কথাসাহিত্যের নতুন প্রজন্মের লেখকদের মধ্যে তিনি এমন এক স্বর, যিনি ডিজিটাল যুগের সম্পর্ক, আত্মপরিচয় এবং আবেগগত জটিলতাকে সরাসরি ও ন্যারেটিভ কাঠামোর স্তরে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর গল্প ও উপন্যাসে প্রযুক্তি কেবল প্রেক্ষাপট নয়; বরং তা চরিত্র নির্মাণ, সংলাপ এবং ন্যারেটিভ গতির একটি সক্রিয় নির্ধারক। অর্পিতা সরকারের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ — 'এসো না অসময়ে', 'প্রাণের আলাপ', 'অপেক্ষার বারোমাস', 'সেই ডায়েরিটা', 'মন আয়নায় মেঘ' এবং 'ট্রাফিক সিগন্যাল' — এইসব রচনায় একদিকে যেমন সম্পর্কের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি ডিজিটাল যোগাযোগের প্রভাবও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষ করে তাঁর গল্পগুলিতে অনলাইন যোগাযোগ, চ্যাট-ভিত্তিক সংলাপ এবং ভার্চুয়াল সম্পর্কের ভঙ্গুরতা একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে উঠে আসে।

অর্পিতা সরকারের গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ডিজিটাল যোগাযোগকে ন্যারেটিভ ফর্ম হিসেবে ব্যবহার করা। তাঁর অনলাইন প্রকাশিত গল্পগুলিতে প্রায়ই দেখা যায়, চ্যাট-লগ বা মেসেজ বিন্যাসই গল্পের মূল কাঠামো। উদাহরণস্বরূপ, একটি গল্পে সংলাপের

© Santiniketan Sahityapath

ধারাবাহিকতা — 'তুমি আছো?'/ 'হ্যাঁ'/ 'কথা বলবে?'/ 'আজ না' — এই সংক্ষিপ্ত বিন্যাসের মধ্যেই একটি সম্পর্কের দূরত্ব ও আবেগগত বিচ্ছিন্নতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই ধরনের ন্যারেটিভ কৌশল প্রথাগত বর্ণনামূলক ধারাকে ভেঙে একটি খণ্ডিত, দ্রুত এবং ইন্টারঅ্যাকটিভ পাঠ অভিজ্ঞতা তৈরি করে, যা ডিজিটাল যুগের যোগাযোগ পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর রচনায় ডিজিটাল উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির দ্বন্দ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ থিম। 'প্রাণের আলাপ'এ সম্পর্কের আবেগগত ওঠানামার মধ্যে বারবার দেখা যায় — চরিত্ররা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু সেই সংযোগ প্রায়ই ভার্চুয়াল স্তরে সীমাবদ্ধ। একটি পরিস্থিতিতে চরিত্রের উপলব্ধি — 'অনলাইনে আছে, তবু আমার জন্য সময় নেই' — ডিজিটাল যুগের সম্পর্কের একটি মৌলিক সংকটকে প্রকাশ করে। এখানে উপস্থিতি আর কেবল শারীরিক নয়; বরং তা একটি ডিজিটাল সূচকে নির্ভরশীল যা আবেগগত প্রতিক্রিয়ার নিশ্চয়তা দেয় না। 'সেই ডায়েরিটা' গল্পে স্মৃতি ও প্রযুক্তির সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা পায়। ডায়েরির ধারণা যেখানে ঐতিহ্যগতভাবে ব্যক্তিগত স্মৃতির প্রতীক, সেখানে ডিজিটাল যুগে এই স্মৃতি চ্যাট হিস্ট্রি, ছবি বা সংরক্ষিত বার্তার মাধ্যমে পুনর্নির্মিত হয়। একটি চরিত্রের অনুভূতি — পুরনো মেসেজ মুছে ফেলতে না পারা — এই ডিজিটাল স্মৃতির স্থায়িত্ব এবং তার মানসিক প্রভাবকে নির্দেশ করে। ফলে স্মৃতি আর ক্ষণস্থায়ী নয়; বরং তা প্রযুক্তির মাধ্যমে স্থায়ী ও পুনরাবৃত্তিমূলক হয়ে ওঠে। অর্পিতা সরকারের 'মন আয়নায় মেঘ'এ ডিজিটাল পরিচয়ের জটিলতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানে চরিত্ররা তাদের ভার্চুয়াল সত্তার মাধ্যমে নিজেদের পুনর্গঠন করে যা অনেক সময় বাস্তব পরিচয়ের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। একটি চরিত্রের প্রশ্ন — 'যাকে তুমি চিনেছো, সে কি সত্যিই আমি?' — ডিজিটাল যুগে পরিচয়ের বহুমাত্রিকতাকে স্পষ্ট করে।

ভাষার দিক থেকেও অর্পিতা সরকারের রচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তাঁর গল্পে Banglish, সংক্ষিপ্ত শব্দ, ইমোজি এবং অসম্পূর্ণ বাক্যের ব্যবহার ডিজিটাল যোগাযোগের প্রভাবকে নির্দেশ করে। এই ভাষা কেবল বাস্তবতার প্রতিফলন নয়; বরং এটি একটি নতুন সাহিত্যিক ভাষা যা পাঠককে সক্রিয়ভাবে অর্থ নির্মাণে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানায়। সবশেষে বলা যায়, অর্পিতা সরকারের রচনায় ডিজিটাল অভিজ্ঞতা একটি বহুমাত্রিক এবং কাঠামোগত শক্তি হিসেবে কাজ করে। তিনি কেবল ডিজিটাল যুগের বিষয়বস্তু নিয়ে লেখেন না; বরং তাঁর লেখার ফর্ম, ভাষা এবং ন্যারেটিভ কৌশল — সবকিছুই এই নতুন বাস্তবতার দ্বারা প্রভাবিত। ফলে তাঁর রচনা সমকালীন বাংলা ছোটগল্পে ডিজিটাল যুগের অভিজ্ঞতাকে বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ টেক্সট হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

সমকালীন বাংলা গল্পকারদের মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা হলো — ডিজিটাল সময়বোধের অন্তর্ভুক্তি। ডিজিটাল যুগে সময় আর সরলরৈখিক নয়; বরং এটি খণ্ডিত, ত্বরিত এবং প্রায়শই একাধিক স্তরে একসঙ্গে উপস্থিত। এই পরিবর্তন গল্পের কাঠামোতেও প্রতিফলিত হয়। অনেক গল্পে দেখা যায়, ঘটনাগুলি ধারাবাহিকভাবে না এগিয়ে বরং চ্যাট মেসেজ, নোটিফিকেশন বা টাইমলাইন পোস্টের মাধ্যমে ভেঙে ভেঙে উপস্থাপিত হচ্ছে। ফলে পাঠককে একটি সক্রিয় ভূমিকা নিতে হয় এবং গল্পের অর্থ নিজেই নির্মাণ করতে হয়। এই ধরনের গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হলো অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত চ্যাট-ভিত্তিক গল্পসমূহ। এসব গল্পে বর্ণনাকারী প্রায় অনুপস্থিত থাকে; পরিবর্তে চরিত্রদের মধ্যে ডিজিটাল সংলাপই গল্পের মূল বাহক হয়ে ওঠে।

নবীন প্রজন্মের লেখকদের মধ্যে যাঁরা সরাসরি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে লিখছেন — তাঁদের লেখায় এই পরিবর্তন আরো তীব্রভাবে প্রতিফলিত হয়। ব্লগ, ফেসবুক পেজ বা অনলাইন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত গল্পগুলিতে আমরা দেখতে পাই যে লেখকরা সচেতনভাবেই ডিজিটাল অভিজ্ঞতাকে তাদের রচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসছেন। এই প্রবণতাটি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে ডিজিটাল প্রযুক্তি শুধু গল্পের বিষয়বস্তু নয়, বরং গল্পের 'কারণ-পরিণাম' কাঠামোকেও প্রভাবিত করছে। আগে যেখানে একটি সম্পর্কের ভাঙন সামাজিক বা মানসিক কারণের উপর নির্ভর করত, এখন সেখানে একটি নোটিফিকেশন বা অনলাইন আচরণই সেই ভাঙনের সূচনা করতে পারে। এছাড়াও, সমকালীন বাংলা ছোটগল্পে ডিজিটাল একাকীত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। এই একাকীত্বের প্রকৃতি ঐতিহ্যগত একাকীত্ব থেকে ভিন্ন। এখানে মানুষ একা নয়, বরং সে ক্রমাগত সংযুক্ত — কিন্তু সেই সংযোগের মধ্যেই একটি গভীর বিচ্ছিন্নতা বিদ্যমান। এই দ্বন্দ্বটি অনেক গল্পে কেন্দ্রীয় থিম হিসেবে উপস্থিত। এই প্রসঙ্গে সমকালীন গবেষণাও ইঙ্গিত দেয় যে বাংলা ছোটগল্পে আবেগ ও সম্পর্কের পরিবর্তন বিশ্লেষণের জন্য ডিজিটাল টেক্সট কর্পাস ব্যবহার করা হচ্ছে। অর্থাৎ, সাহিত্য এখন কেবল পাঠের বিষয় নয়, বরং তথ্য বিশ্লেষণের বিষয়েও পরিণত হয়েছে — যা ডিজিটাল যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

© Santiniketan Sahityapath

আরেকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলো — লেখক ও পাঠকের সম্পর্কের পুনর্গঠন। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পাঠক সরাসরি লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে, মন্তব্য করতে পারে এবং এমনকি গল্পের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনাতেও প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে লেখক আর একক সৃষ্টিকর্তা নন; বরং তিনি একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে ওঠেন। এই পরিবর্তনটি বাংলা ছোটগল্পের নন্দনতত্ত্বকেও প্রভাবিত করছে। এখন গল্পকে এমনভাবে লিখতে হয় যাতে তা দ্রুত পাঠযোগ্য হয়, পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখতে পারে এবং ডিজিটাল স্ক্রিনে উপযোগী হয়। ফলে সংক্ষিপ্ততা, গতি এবং তাৎক্ষণিক প্রভাব — এই তিনটি বৈশিষ্ট্য ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। তবে এই পরিবর্তনের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বও রয়েছে। একদিকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সাহিত্যকে গণতান্ত্রিক করেছে এবং নতুন লেখকদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে; অন্যদিকে এটি সাহিত্যকে কখনো কখনো 'দ্রুত ভোগ্য কনটেন্ট'এ পরিণত করার ঝুঁকিও তৈরি করেছে। এই দ্বন্দ্বটি সমকালীন বাংলা ছোটগল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সমকালীন সাহিত্যিক প্রবণতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য সমাজের পরিবর্তনশীল কাঠামো ও প্রযুক্তিগত প্রভাবকে প্রতিফলিত করে। অর্থাৎ, সাহিত্য এখন আর কেবল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন নয়, বরং একটি বৃহত্তর সামাজিক ও প্রযুক্তিগত বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। সমকালীন বাংলা গল্পকারদের রচনায় ডিজিটাল অভিজ্ঞতার প্রতিফলন একটি বহুমাত্রিক এবং জটিল প্রক্রিয়া। এটি কেবল নতুন বিষয়বস্তু যোগ করে নি, বরং সাহিত্যিক চিন্তা, ভাষা, কাঠামো এবং পাঠ-প্রক্রিয়ার একটি মৌলিক রূপান্তর ঘটিয়েছে। এই রূপান্তর এখনো চলমান, এবং ভবিষ্যতে এটি বাংলা ছোটোগল্পকে আরো নতুন দিক্‌নির্দেশনা দেবে — এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

উপসংহার:

বাংলা ছোটোগল্পে ডিজিটাল ধারণার উপস্থিতি কেবল একটি সাময়িক প্রবণতা নয়, বরং একটি গভীর সাহিত্যিক রূপান্তরের সূচক। এখানে প্রযুক্তি শুধু বিষয়বস্তু নয়, বরং নন্দনতত্ত্ব, ভাষা এবং পাঠ-প্রক্রিয়াকেও পুনর্গঠন করছে। বাংলা ছোটোগল্প বর্তমানে একটি পরিবর্তনশীল অবস্থায় রয়েছে। এটি সম্পূর্ণভাবে প্রথাগত নয়, আবার সম্পূর্ণভাবে ডিজিটালও নয়। বরং এটি একটি হাইব্রিড রূপ, যেখানে দুই ধরনের প্রবণতা একসঙ্গে কাজ করছে। এই হাইব্রিড রূপের মধ্যে সম্ভাবনা যেমন রয়েছে, তেমনি চ্যালেঞ্জও রয়েছে। লেখকদের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো — কীভাবে ডিজিটাল অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যিক গভীরতার সঙ্গে সমন্বয় করা যায়। ডিজিটাল গল্পের ক্ষেত্রে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো — পাঠক আর কেবল গ্রহণকারী নয়, বরং একটি সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। একইসঙ্গে, লেখককেও তার লেখাকে নতুন মাধ্যমের উপযোগী করে তুলতে হচ্ছে।

বাংলা ছোটোগল্পে ডিজিটাল ধারণার ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচক। এটি কেবল নতুন বিষয়বস্তু যোগ করেনি, বরং সাহিত্যিক চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গির একটি মৌলিক রূপান্তর ঘটিয়েছে। নির্দিষ্ট গল্পকারদের রচনা এবং পাঠক-প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট যে এই পরিবর্তন গভীর এবং স্থায়ী। তবে এই পরিবর্তনকে সার্থক করতে হলে প্রয়োজন সমালোচনামূলক সচেতনতা এবং শৈল্পিক সংবেদনশীলতা। সাহিত্য তখনই টিকে থাকে যখন তা সময়ের সঙ্গে সংলাপ বজায় রাখে। ডিজিটাল যুগে বাংলা ছোটোগল্প সেই সংলাপের একটি নতুন ভাষা খুঁজে পেয়েছে — যা এখনো নির্মাণের পথে। তবে এই পরিবর্তনের সফলতা নির্ভর করবে এই বিষয়ে যে লেখকরা কতটা দক্ষতার সঙ্গে ডিজিটাল অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যিক শৈল্পিকতার সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন। অন্যথায়, সাহিত্য কেবলমাত্র দ্রুত ভোগ্য কনটেন্টে পরিণত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়বে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। অর্পিতা সরকার, 'প্রাণের আলাপ', দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০২২
২। অর্পিতা সরকার, 'মন আয়নায় মেঘ', দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০২৩
৩। অর্পিতা সরকার, 'সেই ডায়েরিটা', দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০২১
৪। তিলোত্তমা মজুমদার, 'সংকলিত গল্পসমগ্র', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ২০১৮
৫। প্রচেত গুপ্ত, 'ছোটগল্প সংকলন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১২
৬। মিশেল ফুকো, 'ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশ: দ্য বার্থ অব দ্য প্রিজন', ভিন্টেজ বুকস, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৭
৭। শেরি টার্কল, 'অ্যালোন টুগেদার: হোয়াই উই এক্সপেক্ট মোর ফ্রম টেকনোলজি অ্যান্ড লেস ফ্রম ইচ আদার', বেসিক বুকস, নিউ ইয়র্ক, ২০১১
৮। স্মরণজিৎ চক্রবর্তী, 'নির্বাচিত ছোটগল্প', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৫

—